বি - পি - এল কার্ড কারা পায়, কেন পায়?

নিরঞ্জন হালদার

পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড় নাকি মাওবাদীদের দখলে। অযোধ্যা পাহাড়ে মাওবাদীদের আনাগোনার খবর জানার জন্য পুলিশের গোয়েন্দা পার্থ বিশ্বাস পরিবেশবিদদের অভিনয় করে ভেষজ গাছপালা লাগাচ্ছিলেন। তাঁর এক বন্ধু স্কুল শিক্ষক গিয়েছিলেন বন্ধুর ওখানে অযোধ্যা পাহাড়ে। গত বছর অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে তাঁরা দুজনই নিখোঁজ হন। জানুয়ারি মাঝামাঝিতেও তাঁদের হদিস নেই। অযোধ্যা পাহাড়ে মাওবাদীরা কেন স্থানীয় অধিবাসীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন না, তার কারণ জানতে সাহায্য করবে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে মধুপর্ণা দাসের তদন্ত রিপোর্ট— ''এ রিচম্যানস বি পি এল কার্ড''। রিপোর্টটি ছাপা হয়েছিল ২০১০ সালের ৪ নভেম্বরে। মধুপর্ণা অযোধ্যা পাহাড় ও তার আশেপাশের গ্রামগুলিতে ঘুরেছেন। মাওবাদীরা নিশ্চয়ই ঐ এলাকায় মধুপর্ণার ঘোরার খবর পেয়েছিলেন। তাঁরা জেনেছিলেন, মধুপর্ণা শাসক দল বা পুলিশে খবর দেওয়ার জন্য ঐ গ্রামগুলিতে ঘুরছেন না। তাই মধুপর্ণাকে কোনো বিপদে পড়তে হয়নি। কাগজে প্রায়ই খবর হয়, ঐ গ্রামের গরিব পরিবার বি পি এল কার্ড পায়নি। যাঁদের দোতলা বাড়ি আছে, তাঁরা কার্ড পেয়েছেন। পরিবারের আয় কত দেখা হয় না। হয়তো তিনি শিক্ষকতা করেন, ব্যাঙ্কে ও সরকারী অফিস বা শিল্প সংস্থায় চাকরি করেন। তাঁর পরিবারের আয় অনেক বেশী। কিন্তু জমির পরিমাণ কম। যেমন, হলদিয়ার লক্ষণ শেঠের জমিদারি। হলদিয়া পৌর এলাকার গ্রামগুলিতে জমির পরিমাণের নিরিখে বি পি এল কার্ড দেওযা হয়। তাঁর হয়তো সরকারি চাকুরি আছে, স্কুলে শিক্ষক বা হলদিয়ার শিল্প তালুকে চাকরি করেন। তাঁর বাড়িটিও পাকা। কিন্তু বেতনের টাকা বিচার্য বিষয় না হওয়ায়, তাকে বি পি এল কার্ড দেওয়া আটকায় না। বন্যা ও অতিবৃষ্টির জন্য চাষবাসের ক্ষতি হয়। তিন বছর অতিবৃষ্টিতে সুতাহাটা, হলদিয়া পৌরসভার গ্রামগুলিতে জমির ফসল নষ্ট হয়েছিল। কিন্তু বেশী জমির মালিক বলে তাঁরা বি পি এল কার্ড পাননি। তাই প্রথমেই জানতে হবে, কোন্ কোন্ গ্রামে বি পি এল কার্ড দেওয়ার মাপকাঠি কী?

অযোধ্যা পাহাড় ও পুরুলিয়া জেলার গ্রামগুলিতে দারিদ্র্যের মাপকাঠিতে বি পি এল কার্ড পাওয়া যায় না। বি পি এল কার্ড নিতে হয় টাকা দিয়ে।

বি পি এল কার্ড কেনার তথ্য ঃ

পুরুলিয়া জেলার আরসা ব্লকে ছাতুহানসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ২৫টি গ্রাম। প্রতিটি গ্রামে ৫০ থেকে ৬০টি পরিবার বাস করে। ২০০৫ সালের শেষের দিকে গ্রামবাসীদের মধ্যে বি পি এল কাড বিলি করা হয়। এটা হল সরকারী তথ্য। সরকারী কাগজপত্রের হিসাব অনুসারে, গ্রামের শতকরা ৮০ শতাংশ পরিবারকে বি পি এল কার্ড দেওয়া হয়েছে। ঐ গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মধুপর্ণা জানতে পারেন, গ্রামে মাত্র দুই বা তিন জন বি পি এল কার্ড পেয়েছেন। কাজেই বলা যায়, আরসি ব্লকের গ্রামগুলিতে প্রায় সকলেই এ পি এল (এবভ দি পোভার্টি লেভেল) কার্ড পেয়েছেন। বেশীরভাগ লোকের মাসিক আয় ৫০০ টাকার কম এবং তাঁরা ভাঙ্গাচোরা কুঁড়েঘরে বাস করেন। বি পি এল কাড পেতে হলে ১৩টি শর্ত পালন করতে হয়। এঁরা সব শর্ত পালন করতে পারেনি বলে এঁদের দারিদ্র্যসীমার নিচের রেশন কার্ড পায়নি। কারণ বি পি এল তালিকায় নাম তুলতে যে টাকা দিতে হয়, তা তাঁরা দিতে পারেনি। নালাকুছা গ্রামে ৪০ পরিবারের বাস। মাত্র একটি পরিবারের বি পি এল কার্ডের মালিক ঘরিরাই মাঝির কথা শোনা যাক্ — ''চার বছর আগে পঞ্চায়েত প্রধান আমাদের জানান, আমাদের বি পি এল কার্ড তৈরি হয়ে গিয়েছে। তবে কাড পেতে হলে সদস্যদের ১২০০ টাকা দিতে হবে। আমাদের কারও ১২০০ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। আমার বাবা সি পি এম দলের একজন নেতা, তাই ৭০০ টাকা দিয়ে আমি বি পি এলক কার্ড পেয়েছি। বাবা সি পি এম নেতা তাই আমাকে ৫০০ টাকা কম দিতে হয়েছে।''

ছাতুহানসার আগের পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন যমুনা মাঝি। ২০০৫ সালে গ্রামের যে - কোনো লোক বি পি এল কার্ড টাকা দিয়ে কিনতে পারতেন। তার পরের চার বছর কেউ আর নতুন বি পি এল কার্ড পাননি। কুমিরডিহা গ্রামের বাবুরাম মাহাতোর ছেলে সুনীল মাহাতোর একটি বি পি এল কার্ড আছে। সুনীলের কথায় ''বি পি এল কার্ড পাওয়ার জন্য আমাদের এক হাজার টাকা দিতে হয়েছে। আমাদের পরিবারের দশজন লোক। কিন্তু আয় করার লোক মাত্র দুজন। আমাদের কার্ড দেয়ার পর পঞ্চায়েত থেকে বলা হল, কার্ডে কয়েকটা ভুল আছে। বি পি এল কার্ডটি যার নামে ছিল, তাঁকে না দিয়ে আমাদের দেওয়া হয়েছে। ঐ কার্ডে প্রথমে অঞ্জলি মাঝির নাম লেখা ছিল। পেন্সিল দিয়ে সেই নাম কেটে তার উপর লিখে দেওয়া হয় বাবুরাম মাহাতো। আমরা টাকা দেওয়ায় আমরা অঞ্জলি মাঝির বি পি এল কার্ড পেলাম। আর অঞ্জলি মাঝি পেল এ পি এল কার্ড।

বি. পি. এল. কার্ডের লেনদেন:

কুমারডিহি গ্রামে অনেকেই অভিযোগ করলেন, গ্রামে যাঁদের এ পি এল কার্ড দেওয়া হয়েছে, তাঁদের অনেকেই

গরিবদের কাছ থেকে বি পি এল কার্ড কিনে নেয়। কারণ রেশনে চালের দাম কম হলেও, একসঙ্গে রেশন তোলার মতো টাকা থাকে না। ঐ কুমারডিহি গ্রামে সুবোধ মণ্ডলের বি পি এল কার্ড আছে। তিনি একটি পাকা বাড়িতে বাস করেন। তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের আছে এ পি এল কার্ড। অমরনাথ মণ্ডলের দোতলা বাড়ি। তাঁরও একটি বি পি এল কার্ড আছে। ঐ গ্রামের রঙনু মণ্ডল জানিয়েছেন, তাঁকেও একটি বি পি এল কার্ড কিনতে হয়েছে। আমাদের বাড়ির জিনিস বন্ধক রেখে ৫০০ টাকা পাই এবং সেই টাকা দিয়ে বি পি এল কার্ড কিনি। কিন্তু ঐ কার্ডটা আমার কাছে থাকে না। রেশন - দোকানের মালিক একজন সি পি এম সদস্য। সে আমার কার্ড রেখে দেয়। যাঁর সময়ে ১২০০ টাকায় বি পি এল কার্ড বিক্রি হয়েছিল, সেই প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান এবং সিপিএমের আরসা আঞ্চলিক কমিটির সদস্য যমুনা মাঝি আট বছর (১৯৯৮-২০০৬) পঞ্চায়েত চালিয়েছেন। তিনি জানালেন, তাঁর সময়ে গ্রামে কোনো বি পি এল কার্ড বিক্রি হয়নি। ফরোয়ার্ড ব্লকের হাতে এখন পঞ্চায়েত। আমার নামে বদনাম দেওয়ার জন্য ফরোয়ার্ড ব্লক একথা বলছে. সি পি এমের আঞ্চলিক সেক্রেটারি শিবু মাঝি বলেন, ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্যেরা মাত্র ৭০ শতাংশ বি পি এল কার্ড বিলি করেছে। আমরা এ বিষয়ে বি ডিওর'র কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি। আরসু ব্লকের বি ডি ও সুবর্ণ রায় স্বীকার করেছেন যে ''বি পি এল কার্ডে গরমিল আছে। আমরা যে তালিকা দৈরি করেছি এবং খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ যে - তালিকা তৈরি করেছে, দুটি তালিকার মধ্যে ফারাক আছে। কিন্তু বি পি এল কার্ড বিলি সম্পর্কে গ্রামবাসীদের নিকট থেকে কোনো লিখিত অভিযোগ পায়নি।'' তিনি ঠিক কথাই বলেছেন, গ্রামের লোকদের নিকট থেকে বি পি এল কার্ড বিলিতে দুর্নীতির ব্যাপার তিনি কোনো লিখিত অভিযোগ পাননি। গ্রামের গরিব লোকেরা ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক নেতা- নেত্রীর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ জানাতে সাহস করেন? তা ছাড়া লিখিত অভিযোগ জানানোর মতো শিক্ষা কি তাঁরা পেয়েছেন?

১০০ দিনের কাজের সমস্যা :

বি পি এল কার্ড কেবল রেশন - দোকান থেকে ২টাকা কিলো দামে চাল কেনার জন্য নয়। গ্রামাঞ্চলে বছরে ১০০ দিনের কাজ দেওয়া হয় বি পি এল কার্ডধারীদের মধ্য থেকে এবং পরিবারের মাত্র একজনই ঐ ১০০ দিনের কর্মসূচীতে কাজ পাবে। যদিও, ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে জনতা পার্টির সরকার গ্রামাঞ্চলে যে ''খাদ্যের বদলে কাজ'' কর্মসূচী চালু করেছিল, তাতে পরিবারের সক্ষম ব্যক্তিরা কাজের সুযোগ পেত এবং কাজের দিনের কোনো সীমা নির্দিষ্ট করা ছিল না। যাইহোক, গ্রামের গরিবেরা বি পি এল কার্ড না পেলে, তাঁদের পরিবারের একজন বছরে ১০০ দিনের কাজ পাবেন কী করে? এই আইন কিন্তু পার্লামেন্টে পাস হয়েছে। ১০০ দিনের কাজ করে কি ৩৬৫ দিনের খরচ তোলা যায়? পার্লামেন্ট ও বিধানসভার সদস্য - সদস্যারা কিন্তু বছরে ১০০ দিনের বেতন নেন না, তাঁরা বেতন নেন ৩৬৫ দিনের। তার উপর পার্লামেন্টের হাজিরা খাতায় সই করলেই দিনে দুহাজার টাকা উপরি পাওয়া যায়।

মধুপর্ণার লেখাটি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে ছাপা হয়েছে ৪ নভেম্বর। দুঃখের বিষয়, পত্রিকায় বি পি এল কার্ড কেনাবেচা ছাপা হওয়ার আড়াই মাস পরেও সি পি এম এবং ফরোয়ার্ড ব্লক তাঁদের পঞ্চায়েতের সম্পাদক ও সদস্য - সদস্যাদের বি পি এল কার্ড বিক্রি বন্ধ করতে উদ্যোগী হননি। অথচ মাওবাদীদের বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান শুরু হওয়ায় এলাকায় অধিবাসীরা শাসক দলগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ভয় পাচ্ছেন। গ্রেপ্তার না হলেও মাওবাদী সমর্থক তকমা দিয়ে টাকা আদায় করার সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। যারা এইভাবে গরিবদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে, তারা খুন হলে গ্রামের গরিবেরা নিন্দা করবে কেন? খুনের নিন্দা করার সময় খুন - হওয়া ব্যক্তিদের অপরাধও বিবেচনা করতে হবে। পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ানের সি পি এম নেতা এবং বান্দোয়ান পঞ্চায়েত সমিতির নেতা রবি কর গ্রামের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাকা বাড়ি করার জন্য পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বরাদ্দ ৭৫ হাজার টাকা থেকে ১৫ হাজার টাকা পার্টির নামে আদায় করতেন। স্কুলের বাড়ির জন্য খরচ হত মাত্র ৬০ হাজার টাকা। মাওবাদীরা এই রবি করকে সস্ত্রীক আগুনে পুড়িয়ে মারে। স্থানীয় লোক শোকপ্রকাশ করেননি। শোকপ্রকাশ করতে কলকাতা থেকে বান্দোয়ানে হাজির হয়েছিলেন সি পি এম নেতা বিমান বসু।